## সারদাকাণ্ডে তৃণমূল যোগ

# চোর ধরো
# জেলে ভরো

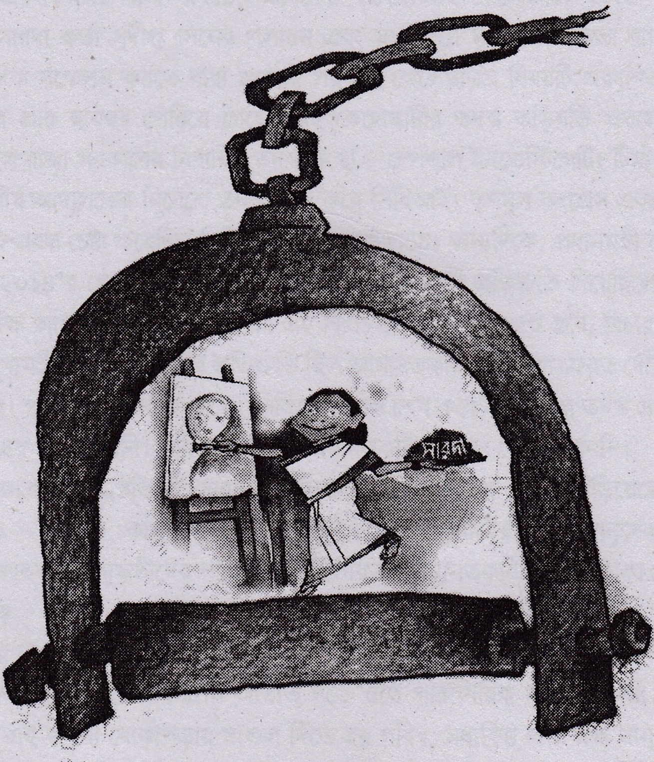


**ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)**

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি**

# সারদা : ডেলো থেকে ধরনা

সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগাযোগ নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল ২০১৩'র এপ্রিলে। যদিও তার আগে একাধিকবার নানা নথিতে, অনেকের বক্তব্যে এই কেলেঙ্কারির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের পলায়ন এবং মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হওয়ার পর এই কেলেঙ্কারির বিষয়টি প্রকাশিত হয়। তারপর প্রায় ছ'বছর পেরিয়ে গেছে। এই কেলেঙ্কারির তদন্ত তড়িঘড়ি প্রথমে শুরু করেছিল রাজ্য সরকারের নির্ধারিত তদন্ত সংস্থা – স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিম(সিট)। পরে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকার প্রবল চেষ্টা করেছিল সিবিআই তদন্ত আটকাতে। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে ২০১৪'র লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, লক্ষ লক্ষ আমানতকারীকে প্রতারণার এই বিরাট কেলেঙ্কারির তদন্ত হবে, বিচার হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতিশ্রুতি ছিল আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেবে তাঁর সরকার। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। সিবিআই তদন্ত শেষ করেনি। আসল তদন্ত এগয়নি, 'চোর'দের বিচার হয়নি। গরিব, মধ্যবিত্ত আমানতকারীরা টাকা ফেরত পাননি।

আজকের পরিস্থিতিতে সারদা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে দুটি বিন্দুতে – প্রথমত, কবে ফয়সালা ও বিচার হবে এই দুর্নীতির? কবে মানুষের টাকা নিয়ে নয়ছয় করা দুষ্কৃতীদের শাস্তি হবে? দ্বিতীয়ত, আমানতকারীরা কবে টাকা ফেরত পাবেন?

আর যা থেকে যাবে ইতিহাসের নথি হিসাবে, তা হলো – কিভাবে একটি দল এবং বিপজ্জনক চিট ফান্ডের গোপন আঁতাত গড়ে ওঠে পারস্পরিক ফায়দার জন্য। আর তাদের এই জঘন্য বোঝাপড়ার মাশুল দিতে হয় গরিব, মধ্যবিত্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে। যাঁদের মধ্যে শতাধিক আত্মহত্যা করেছেন। অনেকের জীবনই বদলে গেছে, স্বাভাবিক রাজনীতির রঙও বদলে দেওয়া হয়েছে ওই কেলেঙ্কারির ফলে। কিন্তু আমরা সম্প্রতি কী দেখলাম? কোন চাপে পাঁচ বছর স্রেফ ঘুমিয়ে সারদাসহ চিট ফান্ডগুলির তদন্তে সিবিআই জেরা করতে চেয়েছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে! সেই

জেরা আটকাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ধর্মতলায় ধরনা দিলেন তিনদিন। দুর্নীতির তদন্ত আটকাতে মুখ্যমন্ত্রীর এমন ধরনা দেশ দেখেনি কখনও।

## সারদা-তৃণমূল বোঝাপড়া

এখন স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস সুদীপ্ত সেনকে তার চিট ফান্ড কোম্পানির জাল ছড়াতে সহায়তা করেছিল। ২০১১ থেকে রাজ্যে সারদার বাড়বাড়ন্ত। মূলত ২০০৯-এ এই বোঝাপড়া তৈরি হয়। তখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এক বড় শরিক তৃণমূল। সেই সময় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে। বদলে সুদীপ্ত সেন গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষের থেকে সংগৃহীত আমানতের টাকা মমতা ব্যানার্জির প্রচারে ব্যবহার করেছিলেন।

সুদীপ্ত সেন মমতা ব্যানার্জির ছবি কিনেছিলেন ২০১১'র ৭ এপ্রিল। অন্তত ২ কোটি টাকায়। তার একমাস পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়েই রাজ্যে চিট ফান্ডগুলির কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে 'সরকারিভাবে' জানতে পেরেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু তারপরও সারদা এবং সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে তাঁর দল। ২০১৪'র ১২ সেপ্টেম্বরে একটি চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়। সেখানেই এক প্রশ্নের জবাবে মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, ''ছবি আমি কাকে বিক্রি করব, তার জবাবদিহি আমি করব না। টাকা রোজগারের জন্য বই লিখি, ছবি আঁকি, কার্ড তৈরি করি – এসব না করলে সংসার চালাবো কী করে?'' তারপরই তিনি আবার বলেন,''ছবি বিক্রির টাকা আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। দলকে এবং 'জাগো বাংলা'কে আমি টাকা দিই।''

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল ভবনে কুপনের চেকমুড়ি পোড়ানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। সেই সম্পর্কে মমতা ব্যানার্জি জনসভায় বলেছিলেন,''আমার পাঁঠা আমি ল্যাজে কাটবো, না মুড়োয় কাটবো, তুমি বলার কোন হরিদাস?'' কেলেঙ্কারি, লোক ঠকানোর ইঙ্গিত এই বেপরোয়া মন্তব্যেই ছিল।

সুদীপ্ত সেন সিবিআই-কে লেখা তাঁর চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ''আমাকে প্রতি মাসে ৬০ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে 'প্রতিদিন'কে। এছাড়াও কুণাল ঘোষ চ্যানেলের চিফ এক্সেকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিযুক্ত হলেন। তাঁর (কুণাল ঘোষের) বেতন হলো প্রতি মাসে ১৫ লক্ষ টাকা। তাঁরা মাসিক ২০ লক্ষ টাকার চুক্তিতে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে এলেন চ্যানেলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসাবে। কিন্তু একটি টক শো ছাড়া চ্যানেলের কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নেননি।'' চিঠির আর একটি জায়গায় সুদীপ্ত অভিযোগ জানিয়েছেন যে, তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ একটি নতুন গাড়ি নিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে। তা ছাড়াও নগদে দেড় লক্ষ টাকা করে কুণাল ঘোষ নিতেন প্রতি মাসে চালকের বেতন, জ্বালানি এবং কিছু 'সামাজিক কাজের জন্য'।

কেন এমন একটি চুক্তিতে তিনি গেলেন? সুদীপ্ত সেনের অভিযোগ, ''প্রতিদিন

আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, এই চুক্তি মেনে চললে তারা সরকারের থেকে আমার ব্যবসা রক্ষা (প্রটেক্ট) করবে।" সেটা কী? সুদীপ্ত সেন জানাচ্ছেন, "রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারও এবং আমি একটি মসৃণ রাস্তা পাব। তারা (কুণাল ঘোষ, সৃঞ্জয় বোস) আমাকে আশ্বস্ত করে যে, তাঁরা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। শেষ দু'বছরে প্রতিদিন পাবলিকেশন এবং প্রতিদিন টেলিভিশন মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৃঞ্জয় বোস ২০কোটি টাকা(প্রায়) নিয়েছে। অধিকাংশ টাকা চেক এবং আরটিজিএস মারফত দেওয়া হয়েছে।"

বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রার্থীদের টাকার জোগানও কী সারদাই দিয়েছিল? এই প্রশ্ন উঠে গেছে। উল্লেখ্য, ছবি বিক্রি নিয়ে কুণাল ঘোষ তাঁর ৯১ পাতার চিঠিতে প্রশ্ন তুলেছেন। কুণাল লিখেছেন, "..সুদীপ্ত সেন ছবি বাবদ নগদে টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু ছবিতে আগ্রহ ছিল না, ছবি হয়ত পানওনি হাতে। প্রদর্শনী ও টাকা তোলার দায়িত্বে ছিল সৃঞ্জয় বোস ও শিবাজী পাঁজা। সুদীপ্তকে এরাই কিনতে বলে। যোগাযোগ করে। সুদীপ্ত রাজি হন। সেইমতো লেনদেন হয়। আমি এতদিন এ নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু জিজ্ঞেস করিনি। ভোট প্রচারে আবার এটা এল বলেই সেনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তাঁর বক্তব্য: ছবি কেনা বাবদ সৃঞ্জয়কে নগদে টাকা দিয়েছি। কিন্তু, ছবি আমি পাইনি। তাছাড়া নেত্রীর ছবি কিনে খুশি করাই তো মূল কথা ছিল। ওঁর ছবিতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। (এই যুক্তিটা অবশ্য প্রায় সব ক্রেতারই)।..."

উল্লেখ্য, ২০১২'র মার্চে রাজ্যের প্রায় আড়াই হাজার পাঠাগারে যে পত্রিকাগুলি রাখার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী জারি করেছিলেন তাতে সারদা গোষ্ঠী পরিচালিত 'সকালবেলা' এবং 'আজাদ হিন্দ'-র নাম ঢুকিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। ২০১৩'র ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত এই সঙ্কটে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছিল বামপন্থীরা। প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার পর সীতারাম ইয়েচুরি অভিযোগ করেছিলেন, "বেশিরভাগ চিট ফান্ড কোম্পানি টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র চালুর ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করছে। অর্থের বিনিময়ে সংবাদ প্রকাশের প্রবণতা যখন ক্রমবর্ধমান, তখন এদের কাজকর্ম সম্পর্কে রাজ্য সরকারের উদাসীনতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।"

মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ২০১১'র মে-তে। সে বছরের ২৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় চিট ফান্ড সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা জানিয়ে প্রথম চিঠি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তৎকালীন যুগ্মসচিব কে কে পাঠক। আবার ওই বছরেরই ২০ অক্টোবর একই বিষয়ে আর একটি চিঠি দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি কে মুরলীধরন। তারপর আবার চিট ফান্ডের দৌরাত্ম্য আটকাতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের আবেদন জানিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেয় কেন্দ্রীয় সরকার – যথাক্রমে ২০১১'র ১৬ ডিসেম্বর এবং ২০১২'র ২৪ ফেব্রুয়ারি।

কিন্তু কোনও চিঠিরই উত্তর দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার।

সারদা গোষ্ঠীর বেআইনি আমানত সংগ্রহের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সেবি'কে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার, ২০১০'র ২৩ এপ্রিল। কেন্দ্রে তখন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। কংগ্রেস-তৃণমূল গলায় গলায় ভাব। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তখন প্রণব মুখার্জি। রেলমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। তাঁর স্ত্রী নলিনী চিদাম্বরম। তখনও নাকি মমতা ব্যানার্জি কিছুই জানতে পারেননি! আরও আছে। তৃণমূল সরকার গঠনের পরে রাজ্যের চিট ফান্ডগুলির ফলাও কারবারের কথা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে ২০১১'র আগস্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সাধন পান্ডে। সেটি অবশ্য তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রকাশ।

সেবি'র কাছে সারদার বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারের অভিযোগ সংক্রান্ত ২০১০'র এপ্রিলের চিঠি (২২১/ডি/ইওআই) এখনো রয়েছে রাজ্যের অর্থ দপ্তরে। সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিষয়ে তদারকি করে কোনও চিঠি সেবি-কে মমতা ব্যানার্জির সরকার লেখেনি। কেন? তাহলে সারদার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি করল কে? কেন দেরি করা হলো? উল্লেখ্য, সেবি-কে লেখা ২০১০'র এপ্রিলের ওই চিঠিটি লিখেছিল অর্থ দপ্তরের অন্তর্গত ডিরেক্টর ইকোনমিক অফেন্সেস ইনভেস্টিগেশন সেল (ইওআইসি)। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর রাজ্যের অর্থদপ্তরের আওতাধীন ওই সেলটিকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। কেন? কাদের কথায়? কাদের স্বার্থে?

## সব জানতেন মমতা ব্যানার্জি

সারদার জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর, ২০১৩'র ২২ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। সেদিন মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, ''যা গেছে, তা গেছে''। তাঁর দাবি ছিল,''আমি তো কিছুই জানতাম না। ১ বৈশাখের পর জানতে পেরেছি।'' অর্থাৎ ২০১৩'র ১৫ এপ্রিলের আগে তৃণমূল নেত্রী সারদার বিষয়ে কিছুই জানতেন না!

কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য নস্যাৎ হয়ে যায় ২০১২'র সেপ্টেম্বরের একটি বৈঠকের বিবরণে। সেদিন রাজ্যের চিট ফান্ডগুলির তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিও সতর্ক করেছিল। এক্ষেত্রে স্টেট লেবেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি (এসএলবিসি)'র ওই বৈঠকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার। দিনটি ছিল ২০১২'র ২৫ সেপ্টেম্বর। সেই বৈঠক হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাষা ভবনে। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ছিলেন সেই বৈঠকে। বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প, প্রাণীসম্পদ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ রাজ্য সরকারের পাঁচটি দপ্তরের সচিবরা। আর সেই বৈঠকেই, তাবড় মন্ত্রী-আমলাদের সামনে চিট ফান্ড নিয়ে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাস্কর সেন। তখন ভাস্কর সেনই ছিলেন রাজ্যের স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির চেয়ারম্যান। বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে সেন বলেন, ''কিছু নন-ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গ্রামের জনতার থেকে নিয়ে প্রচুর টাকা জমা করছে। তারা টাকা ফেরত সম্পর্কে অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির গ্রামীণ শাখা থেকে এই ধরনের অনেক খবর পাচ্ছি।''

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চিট ফান্ডের মাধ্যমে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কাকে আমলই দেননি। চিট ফান্ডগুলির বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কারণ – সারদা গোষ্ঠীর সঙ্গে তৃণমূল এবং তৃণমূলের সরকারের তখন সখ্যতা তুঙ্গে।

সেবির রিপোর্ট অনুসারে ২০১০'র ৩ জুন থেকে ২০১৩'র ১ এপ্রিল পর্যন্ত 'অসংখ্য' চিঠি তারা দিয়েছে সারদা গোষ্ঠীকে। ২০১০'র ১৫ ডিসেম্বর তারা প্রথমবার 'শো কজ' করে সুদীপ্ত সেনদের। ৩ জানুয়ারি, ২০১১ সেই 'শো কজের' জবাব দেয় সারদা গোষ্ঠী। এবং তাতে মোটেই খুশি হয়নি সেবি। ১৫ মে, ২০১২'তে সারদা গোষ্ঠীকে 'পারসোনাল হিয়ারিং' বা শুনানিতেও ডেকেছিল সেবি। সেখানেও নিজেদের সম্পত্তি, টাকা তোলা নিয়ে সারদার প্রতিনিধিদের উত্তর সন্তোষজনক ছিল না। তারপরও অন্তত ন'বার (২০১২'র ১৪ জুন, ৩ সেপ্টেম্বর, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯ ডিসেম্বর এবং ২০১৩'র ২৬ মার্চ, ২৮ মার্চ, ১ এপ্রিল, ২ এপ্রিল) সারদাকে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রমাণ হাজির করতে বলেছে সেবি। কোনোবারই তা হয়নি। সরকারে এসে এই সবই অর্থদপ্তরের অফিসাররা অমিত মিত্রকে জানিয়েছেন। তারপরও কিসের ভরসায় মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভার সদস্য, সাংসদরা সারদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেন? কেন্দ্রীয় সরকারে সাত-সাতজন মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সারদা গোষ্ঠীর এত কাণ্ডর কোনও খবরই পৌঁছায়নি তৃণমূলের কাছে? এটি সম্ভব?

কোনও ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য সরকার। আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া) এবং সেবি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া) বারবার চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে ব্যবস্থা নিতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গত ২৫ আগস্ট, ২০১১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত, তিন দফা চিঠি দিয়ে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে ঐ সমস্ত ভুঁইফোঁড় সংস্থার বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রাজ্য সরকার একটিরও জবাব দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের তৎকালীন সাংসদ সোমেন মিত্র রাজ্যে চিট ফান্ড সংস্থাগুলির বাড়বাড়ন্তের সমস্যা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে। এমনকি, চিট ফান্ডের সঙ্গে তাঁর দলের বেশ কিছু কর্মকর্তা জড়িয়ে পড়ছেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

মমতা ব্যানার্জি কিছু জানতেন না আগে? জেনেশুনেও ডাহা মিথ্যে বলা নয় কি? তিনি কী আড়াল করতে চাইছেন, তা কী বোঝা কঠিন?

## মোদী কা খেল..!

২০১৪'র ২৭ এপ্রিল। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার তুঙ্গে। তিনদিন পরে রাজ্যে তৃতীয় দফার ভোট। নরেন্দ্র মোদী ভাষণ দিয়েছিলেন শ্রীরামপুরে বিজেপি'র জনসভায়। বলেছিলেন, ''দিল্লিতে আমরা সরকার গড়ার পর সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে কড়া তদন্ত হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।'' তাঁর আরও কথা ছিল,''আমি শিল্পীদের সন্মান করি। শুনেছি মমতাজী ভালো ছবি আঁকেন। কিন্তু তাঁর ছবি ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে কে কিনেছেন সেই খরিদ্দারের নামটা কী?'' ইঙ্গিত দিয়েছিলেন – সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত হবে। দোষীদের শাস্তি হবে।

কিন্তু কিছু হয়নি। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের পাঁচ বছর পেরলো। কিন্তু আদতে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা হয়নি।

অথচ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্টেও সারদাসহ চিট ফান্ড কেলেঙ্কারিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ২০১৫'র ৬ ডিসেম্বর ওই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে। দেশজুড়ে চিট ফান্ডের প্রতারণা কারবার রমরমিয়ে চলার পিছনে আইনি কী গলদ রয়েছে সেটা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করেছিল অর্থমন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। রিপোর্টে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিবঙ্গের চিট ফান্ডের প্রতারণার কথা বারে বারে উঠে এসেছে। ৮০'র দশকে চিট ফান্ডের প্রতারণার ঘটনা রোধে ১৯৭৮ এবং ১৯৮২ সালে আইন তৈরি হয়। এতে ঐ কারবার কিছুটা রোধ হলেও ২০10 সালের পর থেকে তা আবার রমরমিয়ে বেড়ে ওঠে। রিপোর্টের ভূমিকায় এতে পশ্চিমবঙ্গ এবং কয়েকটি রাজ্যের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ''এসব রাজ্যে চিট ফান্ডের কারবার অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে চলছিল।'' রিপোর্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কমিটিকে জানায়, রেজিস্টার্ড নয় এসব অব্যাঙ্কিং সংস্থার বেআইনিভাবে এভাবে টাকা তোলার কথা তারা বারবার রাজ্য সরকারগুলিকে জানিয়েছে। এরপরই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর নির্দিষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গের কথা বলেন। তিনি জানান, আমি এটাও বলতে চাই এরকম অনুরোধ আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও জানিয়েছিলাম। ঐ রাজ্যে যে কেলেঙ্কারি (সারদা কেলেঙ্কারি) ফাঁস হয় তার আগেই তাদের এভাবে টাকা তোলার ঘটনাও রাজ্য সরকারকে জানিয়েছিলাম। কমিটির তরফে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রশ্ন রাখা হয় এই সংস্থার (সারদা) এই প্রতারণার বিষয়টি কি কোনভাবেই অনুমান করতে পারেনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। জবাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, সারদার টাকা তোলাটা সঞ্চয়ের প্রকল্পের জন্য সব তোলা হতো না। বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের নামে তোলা হতো। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

কলকাতার রিজিওনাল অফিসে যে রাজ্যভিত্তিক সমন্বয় কমিটির বৈঠক হতো তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা সারদার এসব অনিয়মের কারবার নিয়ে কোনও রিপোর্ট করতেন না। ফলে সারদার অসাধু কারবার নিয়ে কোনও আলোচনাই হতো না। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে সারদা নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ আসতো।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একথাতেই প্রমাণ হয়ে যায় সমন্বয় কমিটির বৈঠকে জেনে শুনেই এসব টাকা লোপাটের সব খবর গোপন করে যেত মমতা সরকার।

কমিটির বৈঠকে বারে বারেই পশ্চিমবঙ্গের নাম উঠে এসেছে। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই তৃণমূলের আমলে চিট ফান্ড ও বেআইনি ভূতুড়ে কোম্পানির টাকা তুলে লোপাট করার ঘটনা বেশি। সেবি কমিটিকে জানায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশে মোট ১৫২টি এরকম ভূতুড়ে কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হওয়া ভূতুড়ে কোম্পানির সংখ্যা ৯২। এরপরে রয়েছে ওড়িশায় ১২টি ও মধ্য প্রদেশে ২৪টি। বাকি সব রাজ্যে তা এক সংখ্যার ঘরে। সেবির মতে, পশ্চিমবঙ্গে যেসব কোম্পানি বেআইনিভাবে শেয়ারে টাকা তুলেছে তারা হলো: রোজভ্যালি (১২৭১ কোটি টাকা), এম পি এস (১৪৫০ কোটি টাকা), সারদা আবাসন (৪৩ কোটি টাকা), সান প্ল্যান্ট অ্যাগ্রো (২৪কোটি টাকা) প্রভৃতি। কমিটির অনেকের মত, পশ্চিমবঙ্গে পালা বদলের পর দেখা যাচ্ছে চোর আর প্রতারকদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। তাই দেশের মধ্যে এসব ঘটনা এখন পশ্চিমবঙ্গেই বেশি।

তবুও নরেন্দ্র মোদীর শাসনে সিবিআই'র তদন্তের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

তাই আদালতও বাধ্য হয়েছে প্রশ্ন করতে – 'কবে বিচার শুরু হবে?'

দিনটি ছিল ২০১৮'র ১৬ জুলাই। সারদা ও রোজভ্যালি চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে কালক্ষেপ এবং রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সিবিআই'র দ্বন্দ্বে তীব্র অসন্তোষ জানায় সুপ্রিম কোর্ট। এই বিরোধকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি' বলে অভিহিত করে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, "আর কবে এই মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে?"

বিচারপতি অরুণ মিশ্র উভয় পক্ষকেই বেশ কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। তিনি সিবিআই-কে প্রশ্ন করেছিলেন, এই মামলার অগ্রগতি কিছু হচ্ছে কি? এই মামলায় তো কিছুই হচ্ছে না। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। আরও নির্দেশ দিয়েছিল, এর পেছনে 'বৃহত্তর চক্রান্ত' খুঁজে বের করতে। কোথায় কী! এতদিনে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অভিযুক্তদের অনেকেই জামিন পেয়ে গিয়েছে। যা হচ্ছে তা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

গত পাঁচ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি'র বোঝাপড়ার আর একটি উদাহরণ হয়ে উঠেছে সারদা কেলেঙ্কারি। সারদা কেলেঙ্কারি তাই নেহাতই আর একটি আর্থিক কেলেঙ্কারি নয়।

## মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রহস্য

কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, ‘‘তিনটে আঁচড় দেব। ১০লাখ টাকায় বিক্রি হবে।...আমার ছবি হাজার টাকা, কোটি টাকায় বিক্রি করব। তোমার কী? তোমার পিতা, পিতামহ, তোমার বউয়ের কী?’’ যদিও তাঁর ছবি নিয়ে তদন্ত শুরু হতেই বদলে গেছে ভাষ্য। ২০১৯’এ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, ‘‘আমার চলে বইয়ের রয়্যালটি আর গানের সুর দেওয়া থেকে।’’ ছবি আঁকা বেমালুম বাদ চলে গেল!

মুখ্যমন্ত্রীর সেই ছবি চিট ফান্ড তদন্তের ভরকেন্দ্রে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া অতিরিক্ত হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবির প্রদর্শনী সংক্রান্ত কিছু তথ্য জমা দিয়েছে সিবিআই। মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা সিংহভাগ ছবির ক্রেতা চিট ফান্ড ও শিখণ্ডী সংস্থা, দাবি সিবিআই’র। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সারদার চ্যানেলে টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও চাঞ্চল্যকর দাবি সিবিআই’র হলফনামায়।

মুখ্যমন্ত্রীর চার দশকের সঙ্গী, কালীঘাটে তাঁর অফিসের সচিব মানিক মজুমদারের বাড়িতেও হানা দিয়েছে সিবিআই। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি প্রদর্শনীর হিসাবের নথি সংগ্রহে। দু’ঘন্টা ধরে চলে তল্লাশি ও বয়ান রেকর্ড। মাত্র কয়েকঘন্টার ব্যবধানে বদলে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কথা। চিট ফান্ড তদন্তে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই’র দাবি, পনজি স্কিমের টাকার সঙ্গে যোগ রয়েছে ছবি প্রদর্শনীর। সেই ইঙ্গিত মিলতেই এবার তথ্য জোগাড়ে তৎপর হয়ে উঠেছে গোয়েন্দা আধিকারিকরা। যে কারণেই মানিক মজুমদারের কাছ থেকে ‘জাগো বাংলা’র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি প্রদর্শনীর হিসাব নিয়েছে সিবিআই। ইতিমধ্যে ছবি বিক্রি কাণ্ডে আরেক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সৃঞ্জয় বসুকেও জেরা করেছে সিবিআই। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষের কাছ থেকেও মিলেছে তথ্য। শুধু তাই নয় সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কারা কিনেছেন, রাজনৈতিক প্রভাবে থাকা ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতি, এমনকি সরকারি আমলা, সকলের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া একাধিক ছবি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ধৃত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ, মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সঙ্গী চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতার কাছ থেকে মমতা ব্যানার্জির আঁকা ছবি বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি নিয়ে এই তদন্ত – পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিরলতম ঘটনা। ছবি বিক্রি কাণ্ডেই ইতিমধ্যে তৃণমূলী সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন, সুব্রত বক্সি ও অধুনা বিজেপি নেতা মুকুল রায়েকে তলব করেছে সিবিআই। এই চারজনই মূলত মুখ্যমন্ত্রীর ছবি প্রদর্শনীর আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। আয় ব্যয়ের তথ্য তাঁদের কাছেই রয়েছে।

তৃণমূলের তরফে ২০১১-১২ সালের আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখানো হয়েছে ছবি বিক্রি করে তারা আয় করেছে ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ২০১২-১৩ সালে আয় করেছে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। এই দুটি বছরই সর্বাধিক টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিক্রি হয়েছিল। আয়করে দেওয়া তৃণমূলের হিসাব, সিবিআই'র কাছে দেওয়ার তৃণমূলের চার বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব বলছে, ২০১২ ও ২০১৩ সালে ছবি বিক্রি থেকে তৃণমূলের আয় হয়েছে ৬ কোটি ৪৬ লক্ষের মতো। আর এখানেই গোল বেঁধেছে।

আয়কর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র দাবি, যা নথি মিলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের দেওয়া হিসাবের থেকে বেশি পরিমাণ টাকায় ভুয়ো সংস্থাগুলি ছবি কিনেছে।

তৃণমূলের চার বছরের হিসাব নিকাশ খতিয়ে দেখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই দেখতে পেয়েছে যে দু'বছরে তৃণমূলের তরফে ছবি বিক্রি করে টাকা 'আয়' হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে ঠিক সেই দু'বছরেই একাধিক ভুয়ো সংস্থা ছবি কেনার 'খরচ' দেখিয়েছে! ঠিক ঐ দুটি বছরই একাধিক ভুয়ো ও শিখণ্ডী সংস্থাগুলি তাদের অডিটে 'ছবি কেনা'র খরচ দেখিয়েছিল! দুটির মধ্যে কী আদৌ কোনও যোগসূত্র রয়েছে? তদন্তকারী সংস্থার দাবি, আছে।

সারদাকাণ্ডের তদন্তে একাধিকবার সামনে এসেছিল ত্রিনেত্র সংস্থার নাম। এই ভুয়ো সংস্থাই গত লোকসভা নির্বাচনের আগে দফায় দফায় তৃণমূলকে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিল। এই ত্রিনেত্র-তে আবার টাকা ঢুকেছিল জগৎজননী নামক একটি ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে। এই সংস্থার অডিট রিপোর্টের গোটা হিসাব দেড়শো, দুশো টাকা নিয়ে অথচ দেখা গিয়েছিল সেই রিপোর্টেই 'ইনভেস্টমেন্ট' কলমে জ্বলজ্বল করছিল ছবি কেনার খরচ! ২০১২ এবং ২০১৩ সালে এই সংস্থা ৬ কোটি টাকার ছবি কিনেছে। ২০১২ সালে চারটি ছবি এই সংস্থা কিনেছে ৪ কোটি টাকায়। তার পরের বছর ২০১৩ সালে তারা দুটি ছবি কিনেছে ২ কোটি টাকায়!

ঐ দুই আর্থিক বছরেই ছবি কেনার খরচ দেখা গেছে ম্যান্ডপম নামে আরেকটি ভুয়ো সংস্থার অডিট রিপোর্টে। অদ্ভুতভাবে জগৎজননী সংস্থার ঠিকানায় গিয়ে দেখা যায় সেখান থেকেই চলছিল ঐ ম্যান্ডপম নামক সংস্থা। দেখা যায় এই ম্যান্ডপম সংস্থা ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে আড়াই কোটি টাকার ছবি কিনেছে। তৃতীয় আরেকটি সংস্থা হলো ত্রিলোক অ্যাডভাইসারি। এটাও কার্যত ভুয়ো সংস্থা। এই সংস্থার সঙ্গেও ত্রিনেত্র, জগৎজননীর মধ্যে আর্থিক লেনদেন ছিল। এই সংস্থার অডিট রিপোর্টে দেখা গেছে ২০১১-১২ আর্থিক বছরেই এরাই সাড়ে ৫ কোটি টাকার ছবি কিনেছে। আরেকটি সংস্থা হলো করুণা ইমপ্লেক্ট লিমিটেড। এদের অডিট রিপোর্টে দেখা গেছে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে তারা ছবি কিনেছিল ৩ কোটি টাকার। প্রাথমিক হিসাবে দেখা গেছে এখানেই অঙ্ক দাড়াচ্ছে ২১ কোটির। তাহলে কি ছবি বিক্রির সমস্ত হিসাবে তৃণমূলের

আয় ব্যয়ের রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়নি? তাহলে দলনেত্রীর ছবি বিক্রির টাকার প্রকৃত পরিমাণ গোপন করেছে তৃণমূল? উঠছে সঙ্গত প্রশ্নই।

একই সঙ্গে চিট ফান্ডের টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও ঢুকেছিল বলে নিশ্চিত সিবিআই। ২০১১'র ২০ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন মমতা ব্যানার্জি। প্রথম দিনই গভীর রাত পর্যন্ত রাইটার্সে কাজ করে 'চমক' দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। পরের দিন ২১ মে রাইটার্সে তিন দফায় সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন তিনি। কত কষ্ট করে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে তার বিবরণ দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, এই সমস্যা লাঘবে তৃণমূলী মুখপাত্র 'জাগো বাংলা' এবং নিজের ছবি বিক্রির টাকা থেকে ১ কোটি টাকা তিনি মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দিয়েছেন।

সিবিআই জানতে পারে ঐ সময়তেই মাউন্টভিউ নামে এক ভুয়ো সংস্থা ১কোটি টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কিনেছিল। এবং সেই টাকা যায় তৃণমূলের তহবিলে। মাউন্টভিউ সংস্থার মাধ্যমে আসলে ঘুরপথে সারদার কালো টাকা সাদা হয়ে ছবির মাধ্যমে ঢুকেছিল 'জাগো বাংলা'র তহবিলে। আর সেই টাকাই মুখ্যমন্ত্রী 'দান' করেন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪'র নভেম্বরে নয়াদিল্লিতে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রীকে সারদা-কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তাতে মেজাজ হারান মমতা ব্যানার্জি। তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেন মাইক। সাংবাদিক মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার সঙ্গে কি সারদার সত্যিই কোনও সম্পর্ক ছিল না? আপনার দলের সাসপেন্ডেড সাংসদ কুণাল ঘোষই তো বলেছেন, মমতা সারদা গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন! মমতা ব্যানার্জি বলেন, ''কে বলেছে? প্রমাণ করুন, পদত্যাগ করব।'' মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সাংবাদিক আবার বলেন, আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার আঁকা ছবি ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এরপরই মাইক ছুঁড়ে ফেলে দেন মমতা ব্যানার্জি।

## তৃণমূলের জমানা চিট ফান্ডের পৌষমাস

২০১১ সালের পর থেকে প্রায় ১৭০০টি সংস্থা দু'লক্ষ কোটি টাকার বেশি বাজার থেকে তুলেছে। সারদার দশ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। রোজভ্যালির পরিমাণ অন্তত ১৫হাজার কোটি। শুধু দুটি সংস্থার প্রতারণাতেই প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

রাজ্যের চিট ফান্ডগুলির বিষয়ে সব জানতো মমতা ব্যানার্জির সরকার। ২০১১'তে সরকার গঠনের সময় থেকেই জানতো। তা মমতা ব্যানার্জি নিজেই স্বীকার করেছেন, রীতিমত হলফনামা দিয়ে আদালতে।

২০১৩'র ৪ মে হাইকোর্টে সারদা জালিয়াতি সংক্রান্ত হলফনামা জমা দিয়েছিল তৃণমূলের সরকার। ডিভিসন বেঞ্চ সরকারকে এই হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই এই হলফনামা দিতে হয়েছিল মমতা ব্যানার্জিকে। নাহলে

এটিও জানা যেত না। আশ্চর্যের আরও বিষয় হলো, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরই ২০১২'র অক্টোবরে রাজ্যের অর্থ সচিবকে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় চিট ফান্ডের বিভিন্ন অসদুপায়ের অভিযোগের বিষয়ে সতর্ক করে। এই কথা মমতা ব্যানার্জির সরকারের জমা দেওয়া হলফনামায় জানানো হয়েছে (পৃষ্ঠা-৬, ভাগ-এইচ)। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে? মমতা ব্যানার্জিই। সেই তাঁরই দপ্তর নাকি সতর্ক করেছিল অমিত মিত্রর অর্থ দপ্তরকে। আর মমতা ব্যানার্জি দাবি করছেন – তিনি কিছুই জানতেন না!

সরকারের হলফনামার ৬নং পাতায় রয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকারের যাবতীয় 'জানা' বিষয়। সরকার জানাচ্ছে – ২০১১'র মে-তে 'ক্ষমতায় এসেই', 'পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে, বর্তমান সরকারও অর্থসচিবকে নির্দেশ দেয়' আগের বিলটির বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। 'অর্থসচিব প্রকৃতপক্ষে গত ১৪ জুলাই, ২০১১'তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে চিঠি লেখে এই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার। এই বিষয়ে আবার মনে করিয়ে দিয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয় ২০১২'র ২৩ ফেব্রুয়ারি। তখন সারদা-তৃণমূল সম্পর্কের হনিমুন-পিরিয়ড চলছে। কোনও ব্যবস্থাই তাই নেওয়া হয়নি।

২০০৯'এ মদন মিত্রকে দেখা গেছে সুদীপ্ত সেনের ভূয়সী প্রশংসা করতে। তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ কয়েক লক্ষ টাকার বেতন নিয়ে কাজ করেছেন সারদা পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলির গ্রুপ সিইও হিসাবে। বর্ধমানের তৃণমূল নেত্রী পিয়ালী মুখার্জি হয়ে উঠেছেন সারদার আইনি উপদেষ্টা। একাধিক তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ট এই তৃণমূল নেত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয় ২০১৩'র মার্চে। কেন খুনের তদন্ত হলো না? প্রকৃত তদন্ত হলে অনেক কিছু কী ফাঁস হয়ে যাবে! পিয়ালীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীকে সব নিয়ম ভেঙে চাকরিতে ঢোকানো হয় নদীয়ার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু পদে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ইমরান হাসানের সঙ্গেও ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছিল সুদীপ্ত সেনের। এখন অভিযোগ উঠেছে, স্বাধীন বাংলাদেশ বিরোধী, উগ্র ধর্মান্ধ জামাত ইসলামীর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল এই ইমরানের। সারদার টাকা তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশে পৌঁছেছে সেখানে সাম্প্রদায়িক জঘন্য শক্তির হাত শক্ত করতে।

বারবার বিধানসভার ভিতরে সরকার পক্ষকে ঐ সমস্ত ভুঁইফোঁড় সংস্থার ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পরপর দু'টো অধিবেশনে প্রশ্নের জবাব রাজ্য সরকার এড়িয়ে গিয়েছে। ২০১২ সালে ১১ ডিসেম্বর দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে, গৃহীত হয়নি। মূলতবি প্রস্তাব এনে চিট ফান্ডের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আলোচনা চাওয়া হয়েছে, সরকারপক্ষ রাজি হয়নি। উলটে ঐদিন মন্ত্রীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন সিপিআই(এম)'র দুই বিধায়ক। তাঁদের একজন রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম, আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অপরজন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি। ডাক্তারি পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে মারের চোটে তাঁর কয়েকটি হাড়ে ফাটল ধরেছে। যতবার চিট ফান্ড

নিয়ে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে ততবার তাঁরা প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছেন। রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনার সময় কিংবা বাজেট বিতর্কে স্বল্পসঞ্চয়ে আয় কমে যাওয়ার প্রসঙ্গে যখনই চিট ফান্ডের বাড়বাড়ন্তের কথা উঠেছে, সরকারপক্ষ নিরুত্তর থেকেছে। তার আগে ২০১১ সালের ২২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে স্মারকলিপি দিয়ে রাজ্যে ভুঁইফোঁড় আর্থিক প্রতিষ্ঠাগুলির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল বামফ্রন্ট পরিষদীয় দল। সেই স্মারকলিপির কপি মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের কাছে পাঠিয়ে অন্ততপক্ষে কয়েকটি ইস্যুতে সহমতের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আলোচনা চাওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী কর্ণপাত করেননি।

## অসহযোগিতা এবং রাজীব কুমার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রথমে সিবিআই তদন্ত আটকাতে চেয়েছেন। তার জন্য আদালতে পর্যন্ত গেছেন। আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে। তারপরও বারবার উঠেছে রাজ্যের অসহযোগিতার অভিযোগ এবং রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশের অতি-সক্রিয়তা।

কলকাতা পুলিশের বাড়তি 'তৎপরতা' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সুপ্রিম কোর্টেও। চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পরে তদন্তের একেবারে গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র সঙ্গেও রীতিমতো বিবাদ হয় বিধাননগর কমিশনারেটের। কেস ডায়েরি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগে আদালতেও যায় সে সময় ইডি। তৃণমূলী সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জি, তাপস পাল পরপর গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ফের সক্রিয়তা বাড়ে কলকাতা পুলিশ ও রাজ্যের তৈরি করে দেওয়া চিট ফান্ড তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট)।

সারদা কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে তদন্তে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, তাপস পাল, সৃঞ্জয় বসু, সুদীপ ব্যানার্জি প্রমুখ। জেরা করা হয়েছে মুকুল রায়সহ অনেককে। সেই তদন্তের সময়েই মিছিল, সভায় নানা কথা বলেছেন মমতা ব্যানার্জিসহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা, মন্ত্রী।

২০১৩'র ৩ মে মমতা ব্যানার্জি কলকাতায় দলীয় সভা করেছিলেন নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। রাজ্য জুড়ে তখন সারদা কেলেঙ্কারিতে যুক্তদের গ্রেপ্তার, প্রতারিত প্রতিটি মানুষের ক্ষতিপূরণের দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। সেদিন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিপিআই(এম)-কে আক্রমণ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেছিলেন, "কুণাল চোর? মদন চোর? টুম্পাই চোর? মুকুল চোর? আমি চোর?"

২০১৩'র ২৪ নভেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করেছিল বিধাননগর পুলিশ। মূলত শাসক দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণেই তাকে গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য পুলিশ। পরে তাকে সিবিআই নিজেদের হেপাজতে নেয়।

প্রতিটি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি ক্ষিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের জেরার প্রশ্ন ঘাড়ের উপর এসে পড়লে তিনি দেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন।

সিবিআই বলেছে, রাজীব কুমার ২০১২ থেকে ২০১৫ বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার ছিলেন। সারদা ও রোজভ্যালি ওই কমিশনারেটের পরিধির মধ্যেই ওই সময়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। পরে রাজীব কুমার চিট ফান্ড তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) প্রধান ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-কে তদন্তভার দেওয়ার পরে দেখা যায় অভিযুক্তদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ গোপন করেছেন, নষ্ট করেছেন। এমনকি সারদার প্রধান অভিযুক্তের হাতে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালের ৯ মে সিবিআই তদন্তভার পায়। এসআইটি-র সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণ রাজীব কুমার সিবিআই-কে দিতে চাইছিলেন না। বারংবার অনুরোধ ও দরবার করার পরে প্রধান অভিযুক্তের সিডিআর (টেলিফোনের কল রেকর্ড) তিনি জমা দেন ২০১৮'র ২৮ জুন। দেখা যায় ওই সিডিআর বিকৃত করা হয়েছে, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে। সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছ থেকে সিবিআই আসল সিডিআর হাতে পেয়েছে। মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে রাজীব কুমার বিকৃত সিডিআর জমা দিয়েছেন। সিবিআই জানিয়েছে, এই প্রমাণ তারা বন্ধ খামে শীর্ষ আদালতকে জমা দেবে।

সিবিআই বলেছে, এখনও রাজীব কুমারের কাছে প্রচুর পরিমাণ হার্ড ডিস্ক ও অন্যান্য তথ্য রয়েছে। এখনও তিনি তা সিবিআই-কে দেননি। তদন্ত চলাকালীন এই রকম সন্দেহ করার জোরালো কারণ পাওয়া গেছে যে ওইসব তথ্যপ্রমাণ তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন বা বিকৃত করতে চলেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে ৩ ফেব্রুয়ারি সিবিআই অফিসাররা যাচ্ছিলেন। তথ্যপ্রমাণ ধ্বংসের অভিপ্রায় না থাকলে ওইভাবে তাঁদের আটকানো হতো না।

সিবিআই বলেছে, রোজভ্যালির কেলেঙ্কারির পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ২০১৩'র ৪ অক্টোবর ওই কেলেঙ্কারির বিষয়ে দুর্গাপুর থানায় এফআইআর জমা পড়েছিল। কিন্তু জেনেশুনেও রাজীব কুমার ওই এফআইআর'র কথা সিবিআই'র কাছে গোপন করে যান। যে-কারণে রোজভ্যালি সংক্রান্ত মামলা দায়ের করতে হয় ওড়িশাতে। সে-রাজ্যে অনেকগুলি ফৌজদারি মামলা রুজু হয়েছিল রোজভ্যালির বিরুদ্ধে।

কোনও রাখঢাক না রেখেই সিবিআই জানিয়েছে, সারদা, রোজভ্যালি, টাওয়ার গ্রুপ সহ আরও কয়েকটি চিট ফান্ডের টাকার লেনদেন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের সঙ্গে। সেই লেনদেনের তথ্য খুঁজে পাওয়া গেছে। লক্ষণীয়ভাবে চেকের মাধ্যমে লেনদেনও হয়েছে। এই প্রমাণও বন্ধ খামে আদালতকে জমা দেবার অনুমতি চেয়েছে সিবিআই।

শিলঙের ৩৮ ঘণ্টায় স্পষ্ট, শুধু সিবিআই নয়, তদন্তের একেবারে গোড়ায় মমতা ব্যানার্জির তৈরি করে দেওয়া 'সিট'র তদন্তেও কাঠগড়ায় উঠেছিল মমতা ব্যানার্জির সরকার।

সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় সিট'র দাবি ছিল টাকা পৌঁছেছিল একাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে। সিট'র দাবি ছিল, সারদা কর্তা লোকসান জেনেও বিপুল পরিমাণ টাকা, প্রায় ৪২০ কোটি টাকা মিডিয়ায় বিনিয়োগ করেছিল। সেই তালিকায় ছিল দিনের আলো দেখতে না পাওয়া একটি চ্যানেল যাতে যুক্ত ছিলেন মূলত কাকের ছবি আঁকা শিল্পী শুভাপ্রসন্ন থেকে বালুরঘাটের তৃণমূলী সাংসদ অর্পিতা ঘোষ, শঙ্কুদেব পণ্ডাও। সিট'র নথিতেই ছিল টাকা পাচার হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি সীমান্ত পেরিয়েও। পুলিশের নজরদারি এড়িয়েই বেমালুম টাকা পাচার হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে করেও।

ফলে খুব স্বাভাবিক সহজ প্রশ্নই উঠছে এরপরে, এত কিছু জানার পরেও কেন সিট'র জেরার মুখে পড়তে হলো না একজনকে? কেন কোন তৃণমূল নেতা (ব্যতিক্রম কুণাল ঘোষ)-কে গ্রেপ্তার করা হলো না? কুণাল ঘোষ গ্রেপ্তারির আগে সাংবাদিক বৈঠক করে একাধিক তৃণমূল নেতার নাম ফাঁস করে দেওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বাধা আসেনি সরকার থেকে।

তাহলে কোন সেই শীর্ষ মহল যেখান থেকে আসা নির্দেশে রাজীব কুমার কিংবা সিট'র বাকি আধিকারিকরা কেউ চিট ফান্ড কাণ্ডে যুক্ত একজন ব্যক্তিকেও জেরা করে উঠতে পারল না?

৩৮ ঘণ্টার জেরায় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে সিবিআই।

সারদাকাণ্ডেই শুধু দশ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। সেই কেলেঙ্কারিকে চাপা দিতে তৎপর কে? কার কথায় অনায়াসে বদলে যেতে পারে সিট'র তদন্ত? কার কথা শিরোধার্য করে তদন্তের নথি প্রমাণ লোপাট এমনকি সিবিআই'র সঙ্গে বেমালুম সংঘাতে যেতে পারেন পুলিশ কমিশনার?

এই উত্তরের জন্য আজকের বাংলায় কোনও ফেলুদার প্রয়োজন হয় না।

উত্তর 'অনুপ্রেরণা'।

রাজীব কুমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে কী মাথায় টান পড়বে? টান পড়তে পারে কী মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কোন প্রভাবশালী সদস্যের? তাতেই কী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 'সংবিধান বাঁচাতে' গোটা সরকার, প্রশাসন নেমে পড়ল রাস্তায়? একজন পুলিশ কমিশনারকে তলব করতে যাওয়ার ঘটনাকে অনায়াসে 'জরুরি অবস্থার চেয়ে খারাপ', 'সংবিধান আক্রান্ত' বলেও দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কী চিট ফান্ড তদন্তের চরম পর্যায়ে আশঙ্কায় ভুগছেন মুখ্যমন্ত্রী?

শুধু এরাজ্য নয়, সাম্প্রতিককালে গোটা দেশে বেনজির ঘটনা। যেখানে একজন

পুলিশ কমিশনারকে তলবের প্রতিবাদে গোটা মন্ত্রিসভা ও প্রশাসন একই সঙ্গে রাতে ধর্মতলায় মঞ্চ খাটিয়ে ধরনায় বসে গেলো। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'রাজীব কুমার পৃথিবীর সেরা পুলিশ অফিসার'! ধরনা থেকে তৃণমূলী বাহিনী বেমালুম স্লোগান তোলে- 'মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ/রাজীব কুমার জিন্দাবাদ'। এমনকি রাতের দিকে কয়েকটি জায়গায় রাস্তা অবরোধ, মিছিলেও শামিল হলো তৃণমূলীরা!

দু'পক্ষই পরে আদালতে যায়। তবে রাজীব কুমারের জেরা ঠেকানো যায়নি। সুপ্রিম কোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ, যদি তথ্য লোপাটের অভিযোগ সত্য হয় তবে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা উনি মনে রাখবেন। পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তার আশঙ্কায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই নিরপেক্ষ জায়গায় শিলঙে জেরার মুখে পড়তে হয় রাজীব কুমারকে।

## টলিউডেও খেটেছে চিটফান্ডের টাকা...

ফি বছর একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে যেকোনও ইস্যুতে কলকাতায় মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই এখন পা মেলান টলিউডের শিল্পীরা। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের জায়গা। যদিও সেই টলিউডের সিনেমার ওপরেই অলিখিত ফতোয়া জারি হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। বাংলা চলচিত্র শিল্পকেও গ্রাস করেছে চিট ফান্ডের টাকা, সহায়তায় তৃণমূল সরকার। চিট ফান্ড কাণ্ডে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্তে সিবিআই'র হাতে গ্রেপ্তার হয় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ টলিউডের প্রভাবশালী প্রযোজক শ্রীকান্ত মেহেতা। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ, বিদেশ সফরের সঙ্গী। নির্বাচনের সময়ও শাসক তৃণমূলের তহবিলকে পুষ্ট করার কাজেও তাঁর অনয়াস দক্ষতা। তিনি পুলিশ প্রশাসনের অন্দরেও 'প্রভাবশালী' বলেই চিহ্নিত হতেন। তাই তাঁর অফিসে সিবিআই' হানা দিলে পুলিশও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

শাসক দলের মদত নিঃসন্দেহে তাঁকে বাড়তি সাহস জুগিয়েছিল। মূলত কী অভিযোগ তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এই টলিউড প্রযোজকের বিরুদ্ধে? রোজভ্যালিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া প্রতারক গৌতম কুণ্ডুকে জেরা করেই উঠে আসে শ্রীকান্ত মেহেতার নাম। গৌতম কুণ্ডু সিবিআই'কে জানায় রোজভ্যালির সঙ্গে ২০০৯-১০ সাল নাগাদ শ্রীকান্ত'র সংস্থা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস (এসভিএফ)'র চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি মোতাবেক রোজভ্যালির তরফে ২৫কোটি টাকা দেওয়া হয় এসভিএফ'কে। বিনিময়ে এসভিএফ'র তরফে ৭০টি সিনেমা রোজভ্যালির চ্যানেলে সম্প্রচার করার কথা ছিল। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা দেখানোর কথা ছিল। কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করে শ্রীকান্ত মেহেতা। ৭০টির জায়গায় মাত্র ২৫টি মতো সিনেমা দেখানো হয় তাও অধিকাংশই পুরানো। টাকা ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও রোজভ্যালিকে তা ফেরত দেওয়া হয়নি। উলটে গৌতম কুণ্ডুর অভিযোগ, তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমনকি টাকা চাইতে গেলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, শাসক দলের ঘনিষ্ঠতার কথাও শোনানো হয়।

তবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অন্য একটি সূত্রের দাবি, এই প্রসঙ্গেই তদন্ত চালাতে গিয়ে উঠে এসেছে অন্য কাহিনি। চিট ফান্ডকাণ্ডে সাইফনিং অর্থাৎ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগও রয়েছে শ্রীকান্ত মেহেতার বিরুদ্ধে। তাঁর সংস্থা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস'র মাধ্যমেও টাকা নয়ছয় হয়েছে। চিট ফান্ডের টাকা ঢুকেছে তাঁর সংস্থায় সেখান থেকেই একাংশের টাকা বেমালুম সাদা হয়ে চলে গেছে 'অন্য ঠিকানায়'। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি সেই 'অন্য ঠিকানা' আসলে শাসক তৃণমূলের তহবিল। চিট ফান্ডের টাকার একটি অংশ এই রুটেই যাতায়াত করেছে।

## তৃণমূলের ফান্ডিং মেশিন কে ডি সিং

সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডুর চেয়েও শাসক তৃণমূলের কাছে 'লোভনীয় সম্পদ' হয়ে উঠেছিলেন কানওয়ারদীপ সিং।

ঝাড়খণ্ড থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত সাংসদ হিসাবে তখনও তাঁর মেয়াদ শেষ হতে প্রায় দুই বছর বাকি ছিল। তার মধ্যেই দল ভাঙিয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে এরাজ্য থেকে তৃণমূলের সাংসদ হিসাবে রাজ্যসভায় পাঠান মমতা ব্যানার্জি। পরবর্তীতে দ্বিতীয় দফাতেও তাঁকে তৃণমূলের প্রতীকে রাজ্যসভায় সাংসদ করা হয়। ভিনরাজ্যের এক ধনকুবের ব্যবসায়ীকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জির এই তৎপরতার কারণ কী ছিল?

অ্যালকেমিস্টের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যে গত কয়েকবছরে পঞ্চাশটিরও বেশি অভিযোগ জমা পড়েছিল একাধিক থানায়। শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। যদিও কার্যত তা উপেক্ষা করেই চলেছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। শাসক তৃণমূলের তহবিলে টাকার স্রোত বইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ছাড় পেয়েছেন এই সাংসদ। ইতিমধ্যে ইডি অ্যালকেমিস্ট ইনফ্রা রিয়েলটির ২৩৯কোটি টাকার সম্পত্তি সাময়িক বাজেয়াপ্ত করেছে। অন্তত ১৯০০ কোটির বেশি টাকা লোপাট করার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত।

কে ডি সিং খাতায় কলমে তৃণমূলী সাংসদ হলেও কৌশলগত কারণেই সম্প্রতি তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব রেখেছিলেন। দিল্লিতে তাঁর বিজেপি ঘনিষ্ঠতাও সকলেই জানে। ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া নিয়েও রীতিমত প্রতারণার কৌশল নিয়েছিলেন তৃণমূলী সাংসদের মালিকানাধীন সংস্থা অ্যালকেমিস্ট। সিবিআই তদন্ত ঠেকাতে আদালতে অ্যালকেমিস্ট সংস্থার তরফে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দাবি করা হয় ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। আদালত সেই দাবির মান্যতা দেয়। অ্যালকেমিস্টের তরফে জানানো হয় ২০১৭'র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাদের বিনিয়োগ ম্যাচুউরিটি হয়েছে তাঁদের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে ৭৪ হাজার আমানতকারীরা তালিকাও তৈরি হয়। কিন্তু আদালতে জানালেও টাকা প্রক্রিয়া ফেরতের প্রক্রিয়ায় ফের প্রতারণা। মাত্র ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত যারা

বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে এরপর জানানো হয়। নির্দিষ্ট দিন অন্তর তা ফেরত দেওয়া হবে, যদিও তাও মানা হয়নি। কার্যত রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতেই তৃণমূলী সাংসদের সংস্থার এই প্রতারণার কারবার বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

২০১৫ সালের ৬ মে সিপিআই (এম) সাংসদ মহম্মদ সেলিম অরুণ জেটলিকে চিঠি লিখে 'অ্যালকেমিস্ট' সংস্থার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আনেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, 'অ্যালকেমিস্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড বেআইনিভাবে হিমাচল প্রদেশে কৃষি জমি দখল করছে।...অ্যালকেমিস্ট কী কালো টাকা সাদা করতেই বেনামী জমি কিনছে. কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি প্রয়োজনে তা তদন্ত করে দেখুক'। শুধু তাই নয় মহম্মদ সেলিম অভিযোগ করেন হিমাচল ছাড়া অন্য একাধিক রাজ্যেও রিয়েল এস্টেট, হোটেল ব্যবসার আড়ালে আসলে বাজার থেকে তোলা চিট ফান্ড টাকা, কালো টাকা সাদা করার চেষ্টাই চলছে। যা সরাসরি মানি লন্ডারিং'র আওতায় পড়ে। খোদ কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রকের তথ্যেই দেখা গেছে কেডিএস কর্পোরেশন নামে যে সংস্থা রয়েছে তাতে কে ডি সিং, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দু'জন ঘনিষ্ঠেরই রয়েছে সিংহভাগ শেয়ার। এই কর্পোরেশনের মালিকানাধীন একাধিক সংস্থা রয়েছে যাদের কোনও অর্থনৈতিক লেনদেনের চেহারা খুঁজে পাওয়া যাবে না, কী তাদের কারবার তা ব্যালান্স শিটেও বোঝা যাবেনা, অথচ সেই কোম্পানিগুলিতেই বেবাক বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কারা করছে? সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডু এরাজ্যেরই বাসিন্দা। কিন্তু ভিন রাজ্য থেকে জুহুরির চোখ দিয়ে বেছে এত বড় প্রতারককে এরাজ্য থেকে কেন সাংসদ করে রাজ্যসভায় পাঠানো হলো তাতেই স্পষ্ট চিট ফান্ডের টাকাতেই বেড়েছে শাসক তৃণমূলের চেহারা।

## সন্দেহজনক সিবিআই'র ভূমিকাও!

২০১৫ সালের ৩০ জানুয়ারি। সিবিআই জেরার মুখে পড়েছিলেন তখন তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' মুকুল রায়। এরাজ্যের বুকে সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তের গতিপথ সেদিনই ঠিক হয়ে যেতে পারত। হয়নি। তারপর চার বছর কেটেছে, একটিবারের জন্যও আর তলবের মুখে পড়তে হয়নি তাঁকে। মুকুল রায়ের জেরা তাই সারদা তদন্তের সন্ধিক্ষণ!

তারপর থেকেই কখনও চড়াই কখনও উতরাই, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হচ্ছে তদন্ত।

'সিবিআই জাগছে', 'সিবিআই শীতঘুমে যাচ্ছে'- পাঁচ বছরের সময়কালে বারেবারে 'শিরোনাম' হয়েছে এমনই!

জেলে গিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এতদিনে ফের স্বমহিমায় মদন মিত্র, ভোটের টিকিট মেলার আশাও রয়েছে।

জেলে গিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কাগজ আর মোহনবাগান ক্লাব নিয়ে স্বমহিমায় সৃঞ্জয় বসু।

জেলে গিয়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের লোকসভায় দুর্নীতি নিয়ে বেমালুম বক্তব্যও রাখছেন সুদীপ বন্দোপাধ্যায়।

কিন্তু চিট ফান্ডের কবলে সর্বস্বান্ত হওয়া লক্ষ লক্ষ আমানতকারীর জীবনে গত ছয় বছরে কোনও নতুন মোড় আসেনি। শুধুই বিপন্নতা। খাদের মুখে সম্বল শুধুই একটুকরো আশা-যদি ফেরত মেলে সঞ্চয়।

খাঁচায় বন্ধ তোতাপাখি কিংবা সুপ্রিম কোর্টের কথায় 'ঘুন ধরা কাঠ' দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার হচ্ছে এটা সত্য। সেই সত্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের তদন্ত দেখলে বিভ্রান্ত হতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। তদন্তে আসছে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নিয়েও কেলেঙ্কারি, চিট ফান্ড কর্তারা কিনেছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, কালো টাকা বেমালুম সাদা হয়ে ঢুকেছে তৃণমূলের তহবিলে।

তারপরে আজও সারদা কাণ্ডে, রোজভ্যালি কাণ্ডে চূড়ান্ত চার্জশিট দিয়ে উঠতে পারলো না সিবিআই। সিট'র মতই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও চিট ফান্ডের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, নিলামে তুলে অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি।

চিট ফান্ড কাণ্ড মানে শুধু শিলঙ বা ভুবনেশ্বর নয়।

চিট ফান্ড কাণ্ড মানে শুধু সারদা বা রোজভ্যালি নয়। ১৭০০টি সংস্থা। দু'লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। এক কোটির ওপর প্রতারিত মানুষ।

দায়িত্ব বামপন্থীদের ওপরেই। আন্দোলনের অভিঘাতেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তদন্ত। আন্দোলনের চাপেই শুরু করাতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া। 'যা গেছে, তা গেছে' বলে পার পেতে দেওয়া যাবে না।

সিবিআই'র চেহারা কী তার আয়না হয়ে উঠতে পারে গত বছরের ২৩ অক্টোবর!

তড়িঘড়ি তাঁর ডেনমার্ক সফর বাতিল করে দিলেন সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন (সিভিসি)'র চেয়ারম্যান কে ভি চৌধুরি। ২৩ অক্টোবরের রাতের ফ্লাইট বাতিল করে রাতেই জরুরি মিটিং ডেকে দিলেন সিভিসি'র চেয়ারম্যান।

রাত সাড়ে এগারোটা–দিল্লি পুলিশ কমিশনার ফোর্সকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন মধ্যরাতে অপারেশনের জন্য। নয়াদিল্লির খান মার্কেটে জড়ো হতে বলা হলো পুলিশ বাহিনীকে।

রাত বারোটা– এনএসএ' থেকে সবুজ সংকেত পেলেন দিল্লির পুলিশ কমিশনার। এরপরেই পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন সিবিআই অফিস দখল নেওয়ার।

রাত সাড়ে বারোটা–দিল্লি পুলিশ সিবিআই দপ্তর ঘিরে ফেলে দখল নেওয়ার চেষ্টা চালানো। বাধা দিল সিআইএসএফ। পুলিশ কমিশনার সিআইএসএফ'র প্রধানের সঙ্গে কথা বললেন। ততক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সিআইএসএফ'র কাছে নির্দেশ চলে

এল, বাধা দেওয়া যাবে না। শেষমেশ সিবিআই দপ্তরের দখল নিল দিল্লি পুলিশ।

রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটা– সিবিআই ডিরেক্টর অলোক ভার্মাকে তাঁর পদ থেকে সরকারের নির্দেশের খসড়া প্রস্তুত করে তা পাঠানো হলো নর্থ ব্লকে। সেখানে মধ্যরাতেও অপেক্ষায় পার্সোনাল দপ্তরের সচিব সি চন্দ্রমৌলি। খসড়া হাতে পাওয়ার পরেই তিনি ছুটলেন পিএমও-তে। ক্যাবিনেট কমিটি এরপরেই অলোক ভার্মাকে সরানোর সুপারিশে সিলমোহর দেয় এবং এম নাগেশ্বর রাওকে সিবিআই ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়।

রাত আড়াইটে–সিভিসি'র আধিকারিকরা ও নাগেশ্বর রাও হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন সিবিআই দপ্তর থেকে।

রাত পৌনে তিনটে–অলোক ভার্মার কাছে তাঁর অপসারণের নির্দেশ পৌঁছালো।

বাস্তবিকই বলিউডি চিত্রনাট্যও হার মানবে মধ্যরাতের এই রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের দৃশ্যপটের কাছে।

কে কবে দেখেছে মধ্যরাতে সিবিআই অফিসের দখল নিয়ে নিয়েছে পুলিশ! সিবিআই'র ডিরেক্টরের টেবিল, ফাইল তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সিবিআই'র মতো একটি সংস্থাকে যেভাবে রাতের অন্ধকারে দখল নেওয়া হলো, যেভাবে মধ্যরাতে ডিরেক্টরকে অপসারণ করা হলো তা স্বাধীন ভারতে সরকারের স্বৈরাচারিতার ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেশবাসীর স্মরণে থাকবে অনেকদিন।

পরিস্থিতি এমনই যে, সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হয়- 'কাঠে ঘুণ ধরলে কাঠের উপযোগিতাই নষ্ট হয়'!

ঘুণ ধরা কাঠ যেমন কাজে লাগে না তেমনি যে খাঁচায় বন্দি তোতাপাখিও নিজের কথা বলতে পারে না তেমনই জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টও। ইউপিএ সরকারের আমলে কয়লার খাদান বরাত নিয়ে সিবিআই-কে কড়াভাষায় ভর্ৎসনা করেই সুপ্রিম কোর্ট দেশের প্রধান তদন্তকারী সংস্থাকে খাঁচায় বন্দি তোতাপাখির সঙ্গে তুলনা করেছিল।

সবচেয়ে আশঙ্কার জায়গা হলো সেটাই। বিশ্বাসযোগ্যতা কী হারাতে চলেছে সিবিআই?

তাতে লাভবান কারা? রাফালের তদন্ত আটকে গেলে লাভবান কোন শিবির? সারদা-নারদের তদন্ত থমকে গেলে খুশি হবে কোন শিবির?

সিবিআই'র তৎপরতারও পছন্দ-অপছন্দ আছে!

নির্বিচারে সশস্ত্র শিবির থেকে গুলি চালাতে চালাতে মানুষ খুন করতে করতে নদীর পাড় ধরে জঙ্গলমহলের বিনপুরের বেলাটিকরির দিকে যে বন্দুকবাজ পালিয়ে গিয়েছিল, মাওবাদী-তৃণমূলীদের দাবি তাঁরই নাম নাকি ফুল্লরা মণ্ডল। অসুস্থ পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা এক হাতে বন্দুক নিয়ে গুলি চালাতে চালাতে মাঠ, খাল, বিল, জঙ্গল পেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে–দুর্ধর্ষ এই অ্যাকশন চিত্র কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও মেনে নিয়েছে। তৃণমূল-

মাওবাদীদের প্রকাশ্য মঞ্চ জনসাধারণের কমিটির এফআইআর করে। একেবারে এফআইআর ধরেই নেতাইকাণ্ডে সিবিআই তদন্ত। চার্জশিট, গ্রেপ্তার সিপিআই(এম)'র নেতা সংগঠক।

অথচ ক্যামেরার সামনে হাত পেতে ঘুষ নেওয়ার পরেও পরীক্ষায় ক্যামেরার ছবির নির্ভুলতা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও সেই দৃশ্য সঠিক কিনা কোন অঙ্গুলি নির্দেশে তা এখনও মেনে নিতে পারেনি সিবিআই! তাই তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তারেরও কোনও সম্ভাবনা এখনও উঁকি মারেনি। ষাটোর্ধ্ব ফুল্লরা মণ্ডল এক হাতে বন্দুক নিয়ে গুলি চালাতে চালাতে পালিয়েছে– সেটা সিবিআই'র কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে অথচ গোপন ক্যামেরার সামনে লক্ষ লক্ষ টাকা স্রেফ হাত পেতে ঘুষ নিচ্ছে তৃণমূলের এক ডজননেতা, মন্ত্রী, সাংসদ। তবুও নাকি যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। একবছর ধরে চলছে তৃণমূলনেতার গলার স্বর পরীক্ষা! তারপরেও নারদ ঘুষকাণ্ডে গ্রেপ্তারির পথে এগতে পারছে না সিবিআই!

সিবিআই'র গৃহযুদ্ধে আপাতভাবে খুশির হাওয়া তৃণমূল শিবিরে।

তবে গোটাকাণ্ডে যেভাবে সিবিআই'র স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে তাতে সারদা-রোজভ্যালি তদন্তে শাসক তৃণমূলের আপাতত সুবিধা হয়েছে বলেই মনে করছে একটি অংশ। যেখানে তদন্তকারী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাই বড়সড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে সেখানে সেই তদন্তে অভিযুক্তদের অপরাধ জনমানসে অনেকটাই লঘু হয়ে যায়।

কিন্তু চার বছর ধরে যেভাবে বারে বারে সিবিআই'র বিরুদ্ধে চিট ফান্ড তদন্তে শ্লথতার অভিযোগ ওঠে, যেভাবে বারেবারে তদন্ত প্রক্রিয়া থমকে যায় তাতে সামগ্রিক তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সুবিধা পাচ্ছে তৃণমূল! সুবিধা কী করে দেওয়া হচ্ছে? কেন তদন্তের ছটি পর্যায়ে মমতা ব্যানার্জির নাম এলেও সে বিষয়ে কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে কোনও তৎপরতা নেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার? কেন তৃণমূলের চার বছরের আয়-ব্যয়ে বিস্তর অসঙ্গতি দেখার পরেও চুপ সিবিআই? কেন গত চার বছরে সারদা ও রোজভ্যালি কাণ্ডে চূড়ান্ত চার্জশিট পর্যন্ত দেওয়া গেল না? কেন সারদা ও রোজভ্যালির কর্ণধার ছাড়া বাকি সকলেই জামিন পেয়ে গেল? কেন নারদকাণ্ডে ১২জন তৃণমূলনেতা ও একজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়ার পরেও কাউকে গ্রেপ্তার করা গেল না?

এই চাপান উতোরের মাঝেই তাই ফের সামনে এসেছে গত চার বছর ধরে এরাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্টদের সেই প্রশ্ন, তদন্তের কী হলো? ক্ষতিগ্রস্তরা কী তাঁদের অর্থ ফেরত পাবে?

সিবিআই কী তবে এই মুহূর্তে শাসক বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষাকারী সেতুর ভূমিকায়? মোদী-শাহ জুটি চাইছে বলেই কী চিট ফান্ড ও নারদ তদন্তে স্বস্তিতে বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবন?

## দলীয় অ্যাকাউন্টেও কেলেঙ্কারি, তবুও এগয় না তদন্ত!

চিট ফান্ড কাণ্ডের তদন্তেই এসেছে শাসক তৃণমূলের আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট নিয়ে অসঙ্গতি। পড়েছে সিবিআই'র নোটিস। সেই সূত্রেই তদন্তে তৃণমূলের অডিট রিপোর্টেও কেলেঙ্কারি। পড়েছে আয়কর দপ্তরের নোটিস। আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডোবা দল।

সেই তৃণমূল যখন বিজেপি' সরকারের দুর্নীতির নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়, আসলে তা নিজের ঘর রক্ষা করার সেটিং মাত্র।

দুর্নীতিতে ডোবা বিজেপি বা দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন হুঁশিয়ারি দেয়, সরকারের এলে পশ্চিমবঙ্গে চিট ফান্ডের টাকা ফেরত দেওয়া হবে, তখন তা আসলে ছায়াযুদ্ধের নিছকই 'হুঁশিয়ারি' মাত্র। আসলে শাসক তৃণমূলের পথই প্রশস্ত করে দেওয়া। সিবিআই'র তদন্তের দীর্ঘসূত্রতা আসলে চিট ফান্ডের মতো বড় কেলেঙ্কারিতে যুক্ত শাসক তৃণমূলকেই বৈধতা দেয়। নির্বাচনের সময় সিবিআই'র তৎপরতা শেষ বিচারে তৃণমূলের পক্ষেই 'ইতিবাচক' হয়ে ওঠে।

সারদা তদন্তের অগ্রগতির দাবি, চিট ফান্ড কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ ফেরতের দাবি বা ' চোর ধরো জেলে ভরো'র স্লোগান আসলে শাসক তৃণমূল ও বিজেপি'র বোঝাপড়ার কৌশল, ধান্দার ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়েরই অংশ।

সেই চার বছরের হিসাবেই বিস্তর অসঙ্গতি মিলেছিল। যদিও তারপরেই তদন্ত অজ্ঞাত কারণে থমকে যায়। রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ওঠে। নথি বলছে অনুদান খাতে তৃণমূলের আয় প্রতি বছর লাফিয়ে বেড়েছে। একইসময় সারদার ব্যবসার গ্রাফও ছিল ঊর্ধ্বমুখী। ২০১১-১২ সালে যেখানে তৃণমূলের অডিট রিপোর্টে অনুদান বাবদ আয় দেখানো হয়েছে ১৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা সেখানে ২০১২-১৩ সালে তৃণমূলের সেই অনুদান বাবদ আয় বেড়ে দাড়ায় ৩৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ঠিক তারপরের বছরই অনুদানের পরিমাণ একলাফে বেড়ে দাড়ায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ঐ ২০১৩-১৪ সালের অডিটে ধরা পড়েছে একই দিনে দু'কোটি টাকা অনুদান নেওয়ার তথ্যও। এরপরেই ২০১৫ সালে সিবিআই' সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের কিছু তথ্য চেয়ে পাঠায়। ঐ ব্যাঙ্কের শাখায় তৃণমূলের ২১টি অ্যাকাউন্ট ছিল। সেই মোতাবেক রাষ্ট্রায়ত্ত এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হরিশ মুখার্জি শাখা সিবিআই' দপ্তরে বিস্তারিত রিপোর্টও পাঠিয়ে দেয়। জানা যায়, যে সন্দেহ থেকে সিবিআই' ব্যাঙ্কের কাছে তৃণমূলের ২১টি অ্যাকাউন্টের নথি চেয়েছিল, সেই সন্দেহই সত্যি হয়েছে। ঐ ২১টি অ্যাকাউন্টের মধ্যে একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে যেখান থেকে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন হয়েছে! কিন্তু তারপরেও সেই তদন্ত একচুল এগয়নি। যা নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি'র বোঝাপড়ার অভিযোগও তোলে বিরোধীরা।

চণ্ডীগড় থেকে অমৃতসর, জলন্ধর থেকে ভাতিণ্ডা-রাস্তাঘাট, হাটে বাজারে কোথায় মমতা ব্যানার্জির মুখ আঁকা তৃণমূলের পতাকা দেখতে পেয়েছে, এরকম মানুষ খুঁজে

পাওয়াও রীতিমত চ্যালেঞ্জ বটে। যদিও সেই পাঞ্জাবেই লোকসভা ভোটের আগে শুধুমাত্র পতাকা কিনতেই নাকি তৃণমূল কংগ্রেস খরচ করেছে ২ কোটি টাকা! তাও আবার ২০১৩-১৪’ সালে। ২ কোটি টাকার পতাকা কেনা হয়েছে, তা যদি বিশ্বাসযোগ্যও হয় তাহলে সেই হিসাব সংশ্লিষ্ট বছরে তৃণমূলের আয় ব্যয়ের রিপোর্টে কেন উল্লেখ করা হলো না? বিস্মিত আয়কর দপ্তরও।

বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। তার আগে ২০১২ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করেই হরিয়ানার পাঁচকুলায় একটি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা হয় ‘সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’র নামে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি- ১৩দিনের মধ্যে কয়েক দফায় ওই অ্যাকাউন্টে নগদে ৮৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা জমা পড়ে। কে সেই টাকা জমা দিল? হরিয়ানায় তৃণমূল কংগ্রেস বলে আদৌ কী কিছু আছে, যদি থেকে থাকে তবে তৃণমূলের কতজন কর্মী কিংবা সমর্থক দলীয় তহবিলে এই টাকা জমা দিল? এর চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন, ফেব্রুয়ারি মাসে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা নেওয়া হলে ২০১১-১২’র সালের আয় ব্যয়ের রিপোর্ট সেই অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব থাকলো না কেন?

দলীয় পতাকার খরচ দেখিয়ে কিংবা অ্যাকাউন্ট খুলে দেদার টাকা সরানোর খেলাই নয়, গুরুতর প্রশ্ন উঠে গেছে মমতা ব্যানার্জি সহ দলীয় নেতাদের হেলিকপ্টার খরচ নিয়েও! আয়কর দপ্তরের দাবি, গত লোকসভা নির্বাচনে হেলিকপ্টার চড়ার পিছনেই তৃণমূলের তরফে ১৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৫৫ টাকা খরচ করা হয়েছে। পবন হংস ও এয়ার কিং চার্টার-এই দুই সংস্থার কাছ থেকে হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। যে পরিমাণ টাকা আবার মেটানো হয়েছিল তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা একেবারে নগদে দেওয়া হয়! যদিও এত বড় আর্থিক লেনেদেনের কোনও বিষয়ই অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করেনি মমতা ব্যানার্জির দল। অডিট রিপোর্ট থেকে বেমালুম ‘উধাও’ ২৪ কোটি টাকা।

আরও একটা লোকসভা নির্বাচন দোড়গোড়ায়। আয়কর দপ্তর নোটিস দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে, তদন্ত এগয়নি। কেন? তার জন্য অন্তত রকেট সায়েন্স পড়ার দরকার নেই।

চিট ফান্ড তদন্তে এতদিন তৃণমূলের বিধায়ক, মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু গত বছর নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি’র হাতে গ্রেপ্তার হলেন এমন একজন যিনি সরাসরি শাসক তৃণমূলের মুখ নন। কিন্তু তৃণমূলের ‘ফান্ড ম্যানেজার’ শুধু নয় সিবিআই-ইডি’র সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের সেটিং’ করে দেওয়ার দায়িত্বেও নাকি তিনি ছিলেন। তাঁর নামও সুদীপ্ত, তবে সেন নয়। সুদীপ্ত রায়চৌধুরি। চিট ফান্ড কাণ্ডে ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’র তদন্ত এই ব্যক্তিকে ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। শাসক দলের একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ,নেতা, বিধায়কের সঙ্গে তাঁর আর্থিক লেনদেন, চিট ফান্ডের বিপুল টাকা বিদেশে পাচারের তথ্য প্রমাণও হাতে এসে গেছে ইডি’র

আধিকারিকদের। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, একেবারে ঠিক জায়গাতেই এতদিনে আঘাত হানতে পেরেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরক্টরেট। রাজ্য ও কলকাতা পুলিশেও তাঁর বিস্তর প্রভাব ছিল। তার জেরেই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিও হয়েছে। তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার 'ম্যানেজ' করে দেওয়ার কাজ করতো সে। সারদা থেকে রোজভ্যালি সহ একাধিক চিট ফান্ড তদন্তে তাঁর নাম আসতে শুরু করে। তৃণমূলের শীর্ষস্তরের নেতাদের সঙ্গে তাঁর প্রবল ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কের তথ্যও হাতে আসে। তাঁর বাড়ির অনুষ্ঠানে একাধিক তৃণমূল নেতা-নেত্রীকে দেখা যেতো। গৌতম কুণ্ডু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে শাসক দলের তিনজন নেতার পরামর্শেই বিপুল পরিমাণ টাকা (কয়েকশো কোটি) তাঁর হাতে তুলে দেয় রোজভ্যালি কর্তা। সেই টাকার একটা অংশ বিদেশে পাচার হয়। অন্য অংশ এরাজ্যের বাজারেই ভাড়া খাটে। যার মুনাফা যায় বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবনে।

## ক্ষতিপূরণের টাকা কোথায়?

মমতা ব্যানার্জির ২০১৩'র এপ্রিলে দাবি ছিল, "আমি কিছুই জানতাম না।" তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল – কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রাখেননি।

২০১৩'র ২৩ এপ্রিল সারদাকাণ্ডে গোটা রাজ্যজুড়ে প্রবল বিক্ষোভের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে দাঁড়িয়ে শ্যামল সেন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। রাজ্যে চরম সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পর স্রেফ জনগণের চোখে ধুলো দিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার ত্রাণ তহবিল গঠনের কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। তামাকজাত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর বসিয়ে নাকি ঐ তহবিলে ১৫০ কোটি টাকা তোলা হবে। যদিও কয়েকদিনের মধ্যে হিসাব নিকেশ করে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে ১০০ কোটি টাকা আসতে পারে ঐ বাড়তি কর থেকে। ২৪ এপ্রিল গেজেট নোটিফিকেশন জারি হয়। সুপ্রিম কোর্ট সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তের রায় দিয়েছিল ২০১৪ সালের ৯ মে। রাজ্য সরকারের শ্যামল সেন কমিশন কাজ বন্ধ করে দেয় ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর। কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়েছে, কিন্তু প্রকাশ করেননি মমতা ব্যানার্জি।

গুটিয়ে যাওয়ার আগে কমিশন সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ৫০০ কোটির মধ্যে মাত্র ২৮৭ কোটি টাকা মিলেছে। তাও আবার তিন দফায়। সেই টাকাতেই মাত্র ৫ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্তের টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। সারদাকাণ্ডেই প্রায় ১৭ লক্ষর বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল কমিশনে। টাকা পেয়েছেন ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার জন। ফলে, শুধু সারদাকাণ্ডেই এখনও আবেদন করেও টাকা ফেরত পাননি ১২ লক্ষ মানুষ। কিন্তু দেখা গেছে যে ২৮৭ কোটি টাকার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কমিশনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে টাকা ফেরতের জন্য খরচ হয়েছে ২৫২ কোটি

টাকা। এই ২৫২ কোটি টাকার মধ্যে ১০২ কোটি টাকার চেক হয় বাউন্স করেছে নতুবা আমানতকারীরা হাতে পেলেও তা ভাঙাতে পারেনি।

অন্যদিকে ২৮৭ কোটি টাকার মধ্যে ২৫১ কোটি টাকার হিসাব দেখালেও ৩৬ কোটি টাকা হাতে রয়ে যায়। ফলে বাউন্স হয়ে আসা ১০২ কোটি টাকা এবং ৩৬ কোটি টাকা পড়ে থাকার কথা রাজ্য সরকারের ঘরে। মোট পরিমাণ ১৩৮ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের দেওয়ার কথা থাকলেও ২১৩ কোটি টাকা কমিশনকে দেয়নি। পাশাপাশি সরকারের দেওয়ার ২৮৭ কোটি টাকার মধ্যে পড়ে রইল ১৩৮ কোটি টাকা, কমিশন সম্পত্তি বেচে পেল আরও দু'কোটি বেশি।

মোট সেই ৩৫৩ কোটি টাকা কোথায় গেল? এটাও রহস্য রয়ে গেল।

কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দেওয়া এবং একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রতারিত আমানতকারীদের বিভ্রান্ত করতেই কি তাহলে কমিশন গঠনের কৌশল?

তাহলে কী দাঁড়ালো? টাকা লুট ও টাকা ফেরত– দু'য়েই সন্দেহজনক ভূমিকায় রাজ্য সরকার।

## বামফ্রন্ট সারদার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল

চিট ফান্ডগুলিকে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। এই অনুমোদন প্রথমে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন কোম্পানি নিবন্ধক, তারপর এই অনুমোদন বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়া প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ইন্ডিয়া (সেবি)'র থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে সেই সংস্থা বন্ধ করতে পারে সিবি-ই।

তৃণমূল কংগ্রেস বারবার বলার চেষ্টা করেছে বামফ্রন্ট সরকার সারদার মতো চিট ফান্ডগুলির অনুমোদন দিয়েছে। এটি পুরোপুরি অপপ্রচার। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই এই কথা প্রচার করা হয়। কারণ, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসই সেই দল, যারা, চিট ফান্ডকে ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। প্রশ্রয় দিয়েছে।

চিট ফান্ড অনুমোদনে রাজ্য সরকারের ভূমিকা না থাকলেও চিট ফান্ড সমস্যার প্রশমনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কী কোনও ভূমিকাই নেই? উত্তর হলো – আছে। এই ক্ষেত্রেই বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পার্থক্য স্পষ্ট। মমতা ব্যানার্জির সরকার এই সমস্যা প্রশমনে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। বরং চিট ফান্ড যাতে বাড়তে পারে, তার জন্য স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে মমতা ব্যানার্জির শাসনে। বামফ্রন্ট কী করেছিল?

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে, ১৯৮০-'৮১-তে সঞ্চয়িতার নিয়মভঙ্গ করে ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রথমে বিধিভঙ্গের অভিযোগে এবং পরে প্রতারণার

অভিযোগের সঞ্চয়িতার কর্ণধারদের গ্রেপ্তার করে, সম্পত্তি আটক করে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আবার ১৯৯০-'৯১-এ ভেরোনা, ওভারল্যান্ড, সঞ্চয়নীসহ ৯৬টির বেশি চিটফান্ডের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বামফ্রন্ট সরকার। গ্রেপ্তার করা হয় ১০০ জনের বেশি কর্ণধারকে। আটক করা হয় সংস্থাগুলির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। ফের ১৯৯৩-'৯৪-এ দেশে নজির তৈরি করে বামফ্রন্ট সরকার। কলকাতা হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জনস্বার্থ মামলা খোদ বামফ্রন্ট সরকারের। প্রতারণাকারী চিট ফান্ডগুলির সম্পত্তি আদালতের রিসিভারের মাধ্যমে নিলামে বিক্রি করে ক্ষতিপূরণের আবেদন রাজ্য সরকারের। ১৯৯৫ সালে আদালতের রায় রাজ্যের পক্ষে। পরে সুপ্রিম কোর্টেও রাজ্যের জয়। পরবর্তীকালে ২০০২-'০৩-এ ফের প্রতারণার অভিযোগ ওঠে কিছু আর্থিক সংস্থার বিরুদ্ধে। অর্থ দপ্তর এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার একটি বিশেষ আর্থিক অপরাধ দমন শাখা খোলে ২০০৪ সালে। ১৭টি সংস্থার কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করে প্রায় ২৫০০ আমানতকারীর টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করেছিল সেই শাখা। ২০০৩'এ বারবার বেআইনি আর্থিক সংস্থার কারবারের রমরমা ঠেকাতে রাজ্যের নিজস্ব আইন তৈরির উদ্যোগ বামফ্রন্ট সরকারের। অন্য কয়েকটি রাজ্যের মতো বামফ্রন্ট সরকারও কঠোর আইনের বিল পাস করায় বিধানসভায়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তা পাঠানো হয় দিল্লিতে। পরবর্তীকালে, সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে সামান্য কয়েকটি পরিবর্তনের পরামর্শসহ বিলটি রাজ্যের কাছে ফেরত আসে ২০০৯'র জুলাইতে। ওই বছরেরই ২২ ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় পরামর্শ মেনে নিয়ে বিধানসভায় পাস করানো হয় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোটেকশন অব ইন্টারেস্ট অব ডিপোজিটরস ইন ফিনান্সিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট বিল ২০০৯। প্রতারক সংস্থার কর্ণধারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রতারক ও সংস্থাটির সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা দিয়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল বিলটিতে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের দশবারের বেশি তাগাদা সত্ত্বেও বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়নি।

সারদাসহ অনেকগুলি চিট ফান্ডের রমরমায় বামফ্রন্ট সরকার উদ্বিগ্ন হলেও কোনও প্রতারণার অভিযোগ না পাওয়ায় রাজ্যের কিছু করার ছিল না। কিন্তু একটি আশঙ্কা প্রকাশ করা চিঠির ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। সারদাসহ চারটি সংস্থার বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের তথ্য ২০১০'র জানুয়ারিতে সরকারের হাতে আসে। ২৩ এপ্রিল, ২০১০ সেই অনুসন্ধান রিপোর্ট বামফ্রন্ট সরকার পাঠায় সেবি-কে। পরের বছর বামফ্রন্ট সরকারের পাঠানো সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সেবি শো কজ করে সারদাকে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে অর্থ দপ্তর, সিআইডি, কলকাতা পুলিশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সেবি যৌথভাবে সারদাসহ চিট ফান্ডগুলির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল। সেই তদন্ত অনেক দূর এগিয়ে ছিল।

বামফ্রন্ট সরকারের সময়েই এই সংক্রান্ত একটি বিল বিধানসভায় গৃহীত হয়। দিনটি ছিল ২০০৩'র ৫ ডিসেম্বর। 'ওয়েস্টবেঙ্গল প্রোটেকশান অব ইন্টারেস্ট অব ডিপোজিটারস ইন ফিনান্সিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট বিল, ২০০৩' শীর্ষক ওই বিলটি যায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য। রাষ্ট্রপতি দীর্ঘদিন বিলটিতে সই করেননি। ২০০৬'র এপ্রিলে ওই বিলটিতে আরও কিছু সংযোজন এবং সংশোধনের সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই অনুযায়ী সংশোধন করে ২০০৮ সালের ১৮ মার্চ বিধানসভায় বিলটি পেশ হয়। তারপর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনার পর ২০০৯ সালের ২৮ আগস্ট আবার পেশ করা হয়। ২০০৯ সালের ২২ ডিসেম্বর বিধানসভায় এই বিলটি অনুমোদিত হয় রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর জন্য। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা ওই বিলটির বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক হওয়া সত্ত্বেও কখনোই কোনও উদ্যোগ তৃণমূল নেয়নি।

ঘটনা হলো, চিট ফান্ডের দৌরাত্ম্য মোকাবিলায় বামফ্রন্টের তৈরি ২০০৯'র বিলটিকেই যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেছিলেন খোদ মমতা ব্যানার্জিই। আদালতে জমা দেওয়া সরকারি হলফনামাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির এই দু'মুখো নীতি স্পষ্ট। সেই বিলটিরই অনুমোদনের জন্য ২০১১'র ১৪ জুলাই রাজ্যের অর্থসচিব চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। সেই একই বিষয়ে, অর্থাৎ ২০০৯'র বিলটিতে অনুমোদন চেয়ে আবার চিঠি লেখা হয় ২০১২'র ২৩ ফেব্রুয়ারি। ২০১২'র অক্টোবরে মুখ্যমন্ত্রীর আওতায় থাকা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজ্যের অর্থ দপ্তরকে চিট ফান্ডগুলির ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম্য নিয়ে সতর্ক করে।

বামফ্রন্ট চিট ফান্ডের টাকা ব্যবহার করেনি। বরং গোড়া থেকেই এই ধরনের পন্‌জি স্কিমগুলির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিল। ১৯৯০'র দশকে অন্তত ৫৫টি সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তৎকালীন রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের ৫০০ কোটি টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করেছিল। সারদার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রথম অভিযোগ বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত করেছিলেন।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮০-'৮১ সালে একটি বৃহৎ নিয়মভঙ্গকারী চিট ফান্ডের (সঞ্চয়িতার)ক্ষেত্রে, প্রতারিত হওয়ার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তারপর ১৯৯১-'৯২ সালে যখন এই ধরনের 'চিট ফান্ড'গুলি (ভেরোনা, ওভারল্যান্ড ইত্যাদি) নিয়মভঙ্গ করে রাজ্যের মানুষকে প্রতারণা করা শুরু করে, তখন প্রতারিত হওয়ার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের অর্থদপ্তর, কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের সমবেত উদ্যোগের মাধ্যমে ৯৬টি নিয়মভঙ্গকারী চিট ফান্ডের ১০০ জনের বেশি কর্ণধারকে গ্রেপ্তার করে। সংস্থাগুলির সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আটক করা হয়। তারপর রাজ্য সরকার মহামান্য কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ে জনস্বার্থবাহী মামলা করে ১৯৯৩ সালে, যাতে

এই সম্পত্তিগুলি ন্যায়ালয় নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিকের মারফত নিলামে বিক্রি করে, অর্জিত অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ সঞ্চয়কারীদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। এই ঐতিহাসিক মামলায় মহামান্য উচ্চন্যায়ালয় রাজ্য সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করেন (১৯৯৫) এবং অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে পদ্ধতিগত কারণে প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার ফলে তারপরের প্রায় এক দশক সময়কালে এই চিট ফান্ডগুলির দৌরাত্ম্য প্রশমিত হয়। কিন্তু ২০০২-'০৩ সালে পুনরায় ১৭টি সংস্থার ক্ষেত্রে নিয়ম ভেঙে প্রতারণার লিখিত অভিযোগ রাজ্য সরকারের হাতে জমা পড়ে। তখন রাজ্য সরকার দু'ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একদিকে অর্থদপ্তরের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অপরাধ অনুসন্ধান শাখা খোলা হয় এবং নিযুক্ত হন দক্ষ অধিকর্তা এবং পুলিশ আধিকারিকগণ। অর্থদপ্তরের এই অনুসন্ধান শাখা এবং কলকাতা ও রাজ্য পুলিসের গোয়েন্দাশাখার মিলিত তৎপরতায় লিখিত অভিযোগগুলির ভিত্তিতে ১৭টি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্ণধারদের গ্রেপ্তার করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলির ক্ষতিগ্রস্ত আবেদনকারীদের (প্রায় ২৫০০) প্রত্যেক গ্রাহককে সরাসরি অর্থ ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়।

অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারই সিদ্ধান্ত নেয় যে রাজ্য নিজে আইন প্রণয়ন করে এই সব সংস্থাগুলি যাতে ভবিষ্যতে মাথাচাড়া দিতে না পারে তার জন্য প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগ্রহণ করতে হবে, বিকেন্দ্রীগতভাবে কলকাতা সমেত প্রতিটি জেলায় প্রশাসনিক এবং বিচারবিভাগীয় পরিকাঠামোর মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থাতেই শাস্তিবিধান, গ্রেপ্তার, সম্পত্তি আটক এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে, যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এই লক্ষ্যে ২০০৩ সালে রাজ্য সরকার বিধানসভায় একটি ক্ষমতাশালী বিল The West Bengal Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments উত্থাপন করে এবং সম্মতিগ্রহণের পর মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। একাধিকবার মতের আদানপ্রদান এবং দিল্লিতে গিয়ে অনুসরণ করার পর ২০০৯ সালে ৩০ জুলাই বিলটি মাননীয়া রাষ্ট্রপতির বক্তব্য সমেত ফেরত আসে। এই বক্তব্যে মূল দুটি ক্ষেত্রে বিলটিতে পরিবর্তনের পরামর্শ ছিল – কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় পড়ে বলে) এই বিলের আওতার বাইরে রাখা এবং সর্বোচ্চ শাস্তিবিধান যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি করা। দুটি পরিবর্তনই গ্রহণ করে একটি নতুন এবং আরও ক্ষমতাশালী বিল ২০০৯ সালের শীতকালীন অধিবেশনেই পেশ করা হয় এবং বিলটি অনুমোদিত হয় (২২ ডিসেম্বর ২০০৯)। উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রপতির বক্তব্য সমেত ফেরত হওয়া বিল যদি নতুন বিল হিসাবে অনুমোদিত হয়, তাহলে সংবিধানের ধারা (২০১ এবং ২০২) এবং বিধানসভার বিধি অনুযায়ী, পুরানো বিলটি সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে যায়। এই নতুন বিলটি তাই কালবিলম্ব না করে ৪ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে

বিধানসভা থেকে রাজ্যপাল মারফত রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অনুমোদনের জন্য এবং বারংবার তাগিদও দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আসেনি। বলা প্রয়োজন, এই বিলটির ৫নং ধারাতে নির্দিষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে কিভাবে অপরাধী সংস্থার সম্পত্তি আটক করা যাবে।

তৃণমূল বারবার কেন্দ্রে সরকারে থেকেছে। কিন্তু কখনো ওই বিলটির অনুমোদনের জন্য তদ্বির করেনি। কেন? শুধু তাই নয়, সারদার যাবতীয় সুবিধা তারা নিয়েছে। আবার আদালতে জমা দেওয়া ২০১৩'র মে-তে হলফ নামাতে মমতা ব্যানার্জির সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সারদা গোষ্ঠীর প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের কোনও দায়িত্ব সরকারের নেই!

বামফ্রন্ট এমন কথা কখনো বলেনি। তারা চিট ফান্ডের টাকা, প্রভাব ব্যবহারও করেনি। তফাৎ স্পষ্ট।

কুড়ি বছর ধরে বেআইনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার একটি অক্ষম অভিযোগ অসহায়, বেপরোয়া ও দিশাহারা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তা সঠিক নয়। ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছরের হিসাব দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, প্রতি বছরই চার-পাঁচটি এরকম বড় সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি গণ্ডির মধ্যে রাজ্য সরকার আর্থিক প্রতারণার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। সেই সব তথ্যই রাজ্যের অর্থ দপ্তরে মজুত রয়েছে। ১৯৯০'র দশকে অন্তত ৫৫টি সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তৎকালীন রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের ৫০০ কোটি টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করেছিল।

মমতা ব্যানার্জির বিস্তর টালবাহানার পর বামফ্রন্টের সময়কালে তৈরি বিলটিকে ভিত্তি করে নতুন বিল তৈরি করে। সেই বিল নিয়ে বিস্তর টালবাহানা হয়। অবশেষে ২০১৬'র ফেব্রুয়ারিতে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোটেকশান অব ইন্টারেস্ট অব ডিপোজিটারস ইন ফিনান্সিয়াল এস্টাব্লিশমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) আইন, ২০১৫' আইন হয়েছে বলে গেজেট নোটিফিকেশন করে সরকার জানায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গত তিন বছরে এই আইনের ভিত্তিতে কোনও গ্রেপ্তার, মামলা করেনি মমতা ব্যানার্জির সরকার। দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি এবং তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণ সমার্থকে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি কেলেঙ্কারি বাদ দিয়ে তৃণমূলকে চেনা যায় না, তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

দাম : ৫ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে সুখেন্দু পানিগ্রাহী কর্তৃক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্ত শীল কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত।